ঈশ্বরবৃত্তির প্রচলন করিয়াছেন; যে কোন মাঠে টাকা দিতে গেলেও দিতে হইবে—টাকা লইতে গেলেও দিতে হইবে। ঐ টাকায় পার্বণ-উপলক্ষে ধুমধাম যাত্রা-থিয়েটার হয়। চৌধুরী নিঃশ্বাস ফেলিল—দীর্ঘনিঃশ্বাস। বৎসরে দেড় টাকা দুই টাকা করিয়া তাহাকে ঐ ঈশ্বরবৃত্তি দিতে হয়।

অমরকুণ্ডার ক্ষেতে এখনও জল রহিয়াছে, জলের মধ্যে প্রচুর মাছ জন্মায়; আল কাটিয়া দিয়া মুখে ঝুড়ি পাতিয়া হাড়ী বাউড়ী ডোম ও বায়েনদের মেয়েরা মাছ ধরিতেছে। ক্ষেতের মধ্যেও অনেকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের দেখা যায় না—কেবল ঘন ধানগাছগুলি চিরিয়া একটা চলন্ত রেখা দেখা যায়, যেমন অগভীর জলের ভিতর মাছ চলিয়া গেলে জলের উপর একটা রেখা জাগিয়া ওঠে ঠিক তেমনি। অনেকে ঘাস কাটিতেছে; কাহারও গরু আছে—কেহ ঘাস বেচিয়া দুই-চার পয়সা রোজগার করে। এই এখানকার জীবন।

অমরকুণ্ডার মাঠের ঠিক মাঝামাঝি একটি প্রশস্ত আলের উপর দিয়া যাওয়া-আসার পথ। প্রশস্ত অর্থে একজন বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, দুইজন হইলে গা ঘেঁষাঘেঁষি হয়। এই পথ ধরিয়া গ্রামের গরু বাছুর নদীর ধারে চরিতে যায়। ধান খাইবে বলিয়া তখন তাহাদের মুখে একটি করিয়া দড়ির জাল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রৌঢ় চৌধুরী একটু হতাশার হাসি হাসিল,—গরুগুলির মুখের জাল খুলিবার মত গো-চরও আর রহিল না।

বন্যারোধী বাঁধের ওপারে নদীর চর ভাঙিয়া রবি ফসলের চাষের একটা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চাষীদের অবশ্য আর উপায়ও ছিল না। অমরকুণ্ডার মাঠের অর্ধেকের উপর জমি কয়েকটি বিভিন্ন ভদ্রলোকের মালিকানিতে চলিয়া গিয়াছে। অনেক চাষীর আর জমি বলিতে কিছুই নাই। এই তাহারাই প্রথম নদীর ধারে গো-চর ভাঙিয়া রবি ফসলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। এখন দেখাদেখি সবাই আরম্ভ করিয়াছে। কারণ চরের জমি খুবই উর্বর। সারা বর্ষাটাই নদীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া পলিতে পলিতে মাটি যেন সোনা হইয়া থাকে। সেই সোনা, ফসলের কাণ্ড বাহিয়া শীষ ভরিয়া দানা হইয়া ফলিয়া ওঠে। গম যব সরিষা প্রচুর হয়; সকলের চেয়ে ভাল হয় ছোলা। ওই চরটার নামই 'ছোলাকুঁড়ি' বা ছোলাকুণ্ড। এখন অবশ্য আলুর চাষেরই রেওয়াজ বেশী। আলু প্রচুর হয় এবং খুব মোটাও হয়। নদীর ওপারের অংশের আলুর বাজারও ভাল। কলিকাতা হইতে মহাজনেরা ওখানে আলু কিনিতে আসে। এ কয় মাসের জন্য তাহাদের এক একজন লোক আড়ত খুলিয়া বসিয়াই

আছে—আলু লইয়া গেলেই নগদ টাকা! বড় চাষী যাহারা, তাহারা বিশ-পঞ্চাশ টাকা দাদনও পায়।

সকলের টানে চৌধুরীকেও গো-চর ভাঙিয়া আলু-গম-ছোলার চাষ করিতে হইতেছে। চারিপাশে ফসলের মধ্যে তাহার গো-চরে গরু চরানো চলে না; অবুঝ অবোলা পশু কখন যে ছুটিয়া গিয়া অন্য লোকের ফসলের উপর পড়িবে—সে কি বলা যায়! তাহার উপর অমরকুণ্ডার মাঠে উৎকৃষ্ট দোয়েম জমিতে রবি ফসলের চাষও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কঙ্কণার ভদ্রলোকের জমি সব পড়িয়া থাকে, তাহারা রবি ফসলের হাঙ্গামা পোহাইতে চায় না; আর খইল-সারেও টাকা খরচ তাহারা করিবে না। কাজেই তাহাদের জমি ধান কাটার পর পড়িয়াই থাকে। অধিকাংশ জমি চাষ হইলে—সেখানে কতকটা জমি পতিত রাখিয়া গরু চরানো যেমন অসম্ভব, আবার অধিকাংশ জমি পতিত থাকিলে—সেখানে কতকটা জমি চাষ করাও তেমনি অসম্ভব। তবু ত গরু-ছাগলকে আগলাইয়া পারা যায়; কিন্তু মানুষ ও বানরকে পারা যায় না। তাহারা খাইয়াই শেষ করিয়া দিবে। কালীপুরের দোয়েম—সোনার দোয়েম!···

এদিকে যুদ্ধ লাগিয়া সব যেন উল্টাইয়া গেল। (প্রথম মহাযুদ্ধ) কি কাল-যুদ্ধই না ইংরেজরা করিল জার্মানদের সঙ্গে? সমস্ত একেবারে লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিল। দুঃখ দুর্দশা সব কালেই আছে, কিন্তু যুদ্ধের পর এই কালটির মত দুর্দশা আর কখনও হয় নাই। কাপড়ের জোড়া ছ-টাকা সাত-টাকা, ওষুধ অগ্নিমূল্য—মায় পেরেক ও সূচের দাম চার গুণ হইয়া গিয়াছে। ধান চালের দরও প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু কাপড়-চোপড়ের দর বাড়িয়াছে তিন গুণ। জমির দামও ডবল হইয়া গিয়াছে। দর পাইয়া হতভাগা মূর্খের দল জমিগুলা কঙ্কনার বাবুদের পেটে ভরিয়া দিল। ফলে এই অবস্থা আজ আপশোশ করিলে কি হইবে!

মরুক, হতভাগারা মরুক! অঃ—সেই তেরোশো একুশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে পঁচিশ সালে; আজ তেরশ উনত্রিশ সাল—আজও বাজারের আগুন নিবিল না। কঙ্কণার বাবুরা ধুলামুঠা সোনার দরে বেচিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনিতেছে, আর কালীপুরের জমি কিনিতেছে মোটা দামে। ধুলা বৈকি! মাটি কাটিয়া কয়লা ওঠে—সেই কয়লা বেচিয়া তো তাহাদের পয়সা। যে-কয়লার মণ ছিল তিন আনা, চোদ্দ পয়সা, আজ সেই কয়লার দর কিনা চোদ্দ আনা। গোদের ওপর বিষ-ফোড়ার মত—এই বাজারে

আবার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতি ঘুচাইয়া ট্যাক্স বাড়াইয়া বসাইল ইউনিয়ন বোর্ড! বাবুরা সব বোর্ডের মেম্বর সাজিয়া দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইয়া বসিল—আর, দাও তোমরা এখন ট্যাক্স! ট্যাক্স আদায়ের ধুম কি! চৌকিদার দফাদার সঙ্গে লইয়া বাঁধানো খাতা বগলে বোর্ডের কেরাণী দুর্গাই মিশ্র যেন একটা লাটসাহেব!

সহসা চৌধুরী চকিত হইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। কে কোথায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না? লাঠিটি বগলে পুরিয়া রৌদ্রনিবারণের ভঙ্গিতে ভ্রূর উপরে হাতের আড়াল দিয়া এপাশ ওপাশ দেখিয়া চৌধুরী পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। হাঁ, পিছনেই বটে। ওই—গ্রাম হইতে কয়জন লোক আসিতেছে, উহাদের ভিতরেই কেহ কাঁদিতেছে; সে স্ত্রীলোক, তাহাকে দেখা যাইতেছে না, সামনের পুরুষটির আড়ালে সে ঢাকা পড়িয়াছে। আ-হা-হা! পুরুষটা কেউটে সাপের মত ফিরিয়া মেয়েটার চুলের মুঠি ধরিয়া দুম-দাম করিয়া প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। চৌধুরী এখান হইতেই চীৎকার করিয়া উঠে—এই, এই; আ-হা-হা! ওই!

তাহারা শুনিতে পাইল কি না কে জানে, কিন্তু স্ত্রীলোকটি চীৎকার বন্ধ করিল; পুরুষটিও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। চৌধুরী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া—আবার রওনা হইল। ছোটলোক কি সাধে বলে! লজ্জা-সরম, রীত-করণ উহাদের কখনও হইবে না। জানে না—স্ত্রীলোকের চুলে হাত দিলে শক্তি ক্ষয় হয়। রাবণ যে রাবণ, যাহার দশটা মুণ্ড, কুড়িটা হাত, এক লক্ষ ছেলে, একশ লক্ষ নাতি, সে যে সে, সীতার চুলের মুঠি ধরিয়া সে একেবারে নির্বংশ হইয়া গেল!

বাঁধের কাছাকাছি চৌধুরী পৌঁছিয়াছে—এমন সময় পিছনে পদ-শব্দ শুনিয়া চৌধুরী ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পাতু বায়েন হন্ হন্ করিয়া বুনো শূকরের মত গোঁভরে চলিয়া আসিতেছে। পিছনে কিছুদূরে ধুপ্ ধুপ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে একটি স্ত্রীলোক। বোধ হয় পাতুর স্ত্রী। সে এখনও গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতেছে—আর মধ্যে মধ্যে চোখ মুছিতেছে। চৌধুরী একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাতু যে-গতিতে আসিতেছে, তাহাতে তাহাকে পথ ছাড়িয়া না দিলে উপায় কি। উহার আগে আগে চলিবার শক্তি চৌধুরীর নাই। পাতু কিন্তু নিজেই পথ করিয়া লইল, সে পাশের জমিতে নামিয়া পড়িয়া ধানের মধ্য দিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চৌধুরীকে একটি প্রণাম করিয়া বলিল—তাখেন চৌধুরী মশায়, তাখেন।

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। কপালে একটা সদ্য আঘাতচিহ্ন হইতে রক্ত ঝরিয়া মুখখানাকে রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—ওগো, বাবুমশায় গো। খুন করলে গো!

—এ্যা-ও! পাতু গর্জন করিয়া উঠিল।...আবার চেঁচাতে লাগিলি মাগী?

সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নামিয়া গেল; সে গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—গরীবের কি দশা করেছে দেখেন গো; আপনারা বিচার করেন গো।

পাতু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিঠ দেখাইয়া বলিল—দেখেন পিঠ, দেখেন।

এবার চৌধুরী দেখিল পাতুর পিঠে লম্বা দড়ির মত নির্মম প্রহার কিছু রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দাগ একটা দুইটা নয়—দাগে দাগে পিঠটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত! চৌধুরী অকপট মমতা ও সহানুভূতিতে বিচলিত হইয়া উঠিলেন, আবেগ-বিগলিত স্বরেই বলিল—আ-হা-হা। কে এমন কল্লেরে পাতু?

—আজ্ঞে, ওই ছিরু পাল। রাগে গন্ গন্ করিতে করিতে প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই পাতু উত্তর দিল—কথা নাই, বার্তা নাই, এসেই একগাছা দড়ির বাড়ীতে দেখেন কি করে দিলে দেখেন!...আবার সে পিছন ফিরিয়া ক্ষত-বিক্ষত পিঠখানা চৌধুরীর চোখের সামনে ধরিল। তারপর আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দড়িখানা চেপে ধরলাম তো একগাছা বাখারীর ঘায়ে কপালটাকে একেবারে দিল কাটিয়ে।

ছিরু পাল—শ্রীহরি ঘোষ? অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। উঃ! নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। চৌধুরীর চোখে অকস্মাৎ জল আসিয়া গেল? এক এক সময় অপরের দুঃখ-দুর্দশায় মানুষ এমন বিচলিত হয় যে, তখন নিজের সকল সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিয়া নির্যাতিতের দুঃখ যেন আপন দেহমন দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে। চৌধুরী এমনই একটি অবস্থায় উপনীত হইয়া সজলচক্ষে পাতুর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার রক্তহীন মুখের শিথিল ঠোঁট দুইটি অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গিতে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পাতু বলিল—মোড়লদের কি-জনার কাছে গেলাম। তা কেউ রা কাড়লে না মশায়। শত্তুর সব দুয়োর মুক্ত।

পাতুর বউ অশুচ্ছ কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলিতেছিল—ওই সর্বনাশী কালামুখীর লেগে গো—

পাতু একটা ধমক দিয়া বলিল—এ্যাই—এ্যাই, আবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে!

চৌধুরী একটু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—কেন অমন করে মারলে? কি এমন দোষ ক'রেছ তুমি যে—।

অভিযোগ করিয়া পাতু কহিল—সেদিন চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে ব'লতে গেলাম—তা তো আপনি শুনলেন না, চলে গেলেন। গোটা গেরামের লোকের 'আণ্ডোটজুতি' আমাকে সারা বছর যোগাতে হয়; অথচ আমি কিছুই পাই না। তা কর্মকার যখন রব তুললে, তখন আমিও বলেছিলাম যে, আমি আর 'আণ্ডোটজুতি' যোগাতে লারব। কাল সন্ধ্যেতে পালের মুনিষ আণ্ডোটজুতি চাইতে এসেছিল—আমি বলেছিলাম—পয়সা আন গিয়ে। তা আমার বলা বটে! আজ সকালে উঠে এসেই কথা নাই বাত্তা নাই—আথালি-পাথালি দড়ি দিয়ে মার!

চৌধুরী চুপ করিয়া রহিল। পাতুর বউ বার বার ঘাড় নাড়িয়া মৃদু বিলাপের সুরে সেই বলিয়াই চলিল—না গো—বাবুমশায়—

পাতু তাহার কথা ঢাকিয়া দিয়া বলিল—আমার পেট চলে কি ক'রে—সেটা আপনারা বিচার করবেন না, আর এমনি করে মারবেন?

চৌধুরী কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—শ্রীহরি তোমাকে এমন করে মেরেছে—মহা অন্যায় করেছে, অপরাধ করেছে, হাজারবার লক্ষবার, সে কথা সত্যি। কিন্তু 'আণ্ডোটজুতি'র কথাটা তুমি জান না বাবা পাতু! গাঁয়ের ভাগাড় তোমরা যে দখল কর—তার জন্যেই তোমাদিগে গাঁয়ের 'আণ্ডোটজুতি' যোগাতে হয়। এই নিয়ম। ভাগাড়ে মড়ি পড়লে তোমরা চামড়া নাও, হাড় বিক্রি কর—তারই দরুণ তোমরা ওই 'আণ্ডোটজুতি' মাংস কাটিয়া লইয়া যাওয়ার কথাটা আর চৌধুরী ঘৃণাবশে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

পাতু অবাক হইয়া গেল; সে বলিল ভাগাড়ের দরুণ!

হ্যাঁ! তোমাদের প্রবীণেরা তো কেউ নাই, তারা সব জানত।

—শুধু তাই লয়, মশায়; ওই পোড়ামুখী কলঙ্কিনী গো। এই ফাঁকে পাতুর বউ আবার সুর তুলিল।

পাতু এবার সঙ্গে সঙ্গে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু তো 'আণ্ডোটজুতি' ও